

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩

প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ৬

সূরা ইনশিরাহ

সূরা ইনশিরাহ পবিত্র কুরআনের ৯৪ তম সূরা। এর আয়াত সংখ্যা ৮, এটি মক্কায় অবতীর্ণ তাই ইনশিরাহ মক্কি সূরা।

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ দুটিকেই এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময় - কাল

সূরা আদ দুহার সাথে এর বিষয়বস্তুর গভীর মিল দেখা যায়। এ থেকে মনে হয় এ সূরা দু'টি প্রায় একই সময়ে একই অবস্থার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মক্কা মু'আযযমায় আদ দুহার পরেই এই সূরাটি নাযিল হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরাটির উদ্দেশ্যও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দান করা। নবুওয়াত লাভ করার পর ইসলামী দাওয়াতের কাজ শুরু করার সাথে সাথেই তাঁকে যেসব অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়, নবুওয়াত লাভের আগে তাঁকে কখনো তেমনি অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়নি। তাঁর নিজের জীবনে এটি ছিল একটি মহাবিপ্লব। নবুওয়াতে পূর্ব জীবনে এ ধরনের কোন বিপ্লবের ধারণা ছিল না। তিনি ইসলাম প্রচারে কাজ শুরু করার সাথে সাথেই দেখতে দেখতে সমগ্র সমাজ তাঁর দূশমন হয়ে যায়। অথচ পূর্বে এই সমাজে তাঁকে বড়ই মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হতো। যেসব আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, গোত্রীয় লোকজন ও মহল্লাবাসী ইতিপূর্বে তাঁকে মাথায় তুলে রাখতো তারাই এখন তাঁকে গালিগালাজ করতে থাকে। মক্কার এখন আর কেউ তাঁর কথা শুনতে প্রস্তুত ছিল না। পথে তাঁকে দেখলে লোকেরা শিস দিতো, যা তা মন্তব্য করতো। প্রতি পদে পদে তিনি সংকটের সম্মুখীন হতে থাকেন। যদিও ধীরে ধীরে এসব অবস্থার মোকাবেলা করতে তিনি অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু তবুও এই প্রথম দিকের দিনগুলো তাঁর জন্য ছিল বড়ই কঠিন এবং এগুলো তাঁর মনোবল ভেঙ্গে দেবার জন্য যথেষ্ট ছিল।

এই সূরায় মহান আল্লাহ প্রথমেই তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন, আমি তোমাকে তিনটি বিরাট বিরাট নিয়ামত দান করেছি। এগুলোর উপস্থিতিতে তোমার মানসিক দিক দিয়ে ভেঙ্গে পড়ার কোন কারণ নেই। তার মধ্যে একটি হচ্ছে হৃদয়দেশ উন্মুক্ত করে দেয়ার নিয়ামত। দ্বিতীয় নিয়ামতটি হচ্ছে, নবুওয়াত লাভের পূর্বে যে ভারী বোঝা তোমার কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছিল তা কি আমি তোমার ওপর থেকে নামিয়ে দেইনি? তৃতীয়টি হচ্ছে, সুনাম ও সুখ্যাতিকে উঁচু আসনে প্রতিষ্ঠিত করার নিয়ামত। এই নিয়ামতটি তাঁর চেয়ে বেশী আর কাউকে দেয়া তো দূরের কথা তাঁর সমানও কাউকে কখনো দেয়া হয়নি। সামনের দিকের ব্যাখ্যার আমি এ তিনটি নিয়ামত বলতে কি বুঝানো হয়েছে এবং এগুলো কত বড় নিয়ামত ছিল তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।

এরপর বিশ্ব - জাহানের প্রভু তাঁর বান্দা ও রসূলকে এই র্মমে নিশ্চিন্ততা দান করেছেন যে ,সমস্যা ও সংকটের যে যুগের মধ্য দিয়ে তুমি এগিয়ে চলছো এটা কোন সুদীর্ঘ যুগ নয় । বরং এখানে সমস্যা ,সংকট ও সংকীর্ণতার সাথে সাথে প্রশস্ততার যুগও চলে আসছে। এই এক কথাই সূরা আদ দুহায় এভাবে বলা হয়েছে : তোমার জন্য প্রত্যেকটি পরবর্তী যুগ পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে ভালো হবে এবং শীঘ্রই তোমার রব তোমাকে এমন সবকিছু দেবেন যাতে তোমার মন খুশীতে ভরে যাবে।

সবশেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে , প্রাথমিক যুগের এসব কঠিন অবস্থার মোকাবেলা করার শক্তি তোমার মধ্যে সৃষ্টি হবে একটি মাত্র জিনিসের সাহায্যে । সেটি হচ্ছে : নিজের কাজ - কর্ম থেকে ফুরসত পাবার সাথে সাথেই তুমি পরিশ্রম পূর্ণ ইবাদাত ও আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্ত হয়ে যাও । আর সমস্ত জিনিসের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজের রবের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করো এটি সেই একই উপদেশের পুনরাবৃত্তি যা সূরা মুয্যামমিলের ৯ আয়াতে আরো বেশী বিস্তারিতভাবে তাঁকে দান করা হয়েছে।

আগের সূরা ও পরের সূরার সাথে সম্পর্ক

বিষয়বস্তুর দিক থেকে আগের (৯৩ নং) সূরা আদ দুহা এর সাথে এই (৯৪ তম) সূরা আল ইনশিরাহ এর গভীর মিল রয়েছে। ১ম ভাগে আল্লাহর দেয়া বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে, পরের ভাগে পাওয়ার পর বিনিময়ে দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। সূরা আদ দুহার ৬ নং আয়াতের গঠন ও বিষয়বস্তুর সাথে সূরা আল ইনশিরাহ এর ১ নং আয়াতের গঠন ও বিষয়বস্তুর মিল রয়েছে। এভাবে ৭, ৮ এর সাথে ২; ১১ এর সাথে ৮ এর মিল রয়েছে। এক কথায় ২ টি সূরার গঠন, বিষয়বস্তু, ধারা-বর্ণনাতে গভীর মিল বিদ্যমান।

সূরা ইনশিরাহে মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত ও মর্যাদা কথা উল্লেখ আছে আর ৯৫ নং সূরা আত ত্বীন এ আল্লাহর অন্যান্য নবীদের বড়ত্বের কথা উল্লেখ করেছেন (আয়াত ১-৩),

তাকসীর

أَمْ نَشْرِكُ لَكَ صَدْرَكَ

১. আমরা কি আপনার বক্ষ আপনার কল্যাণে প্রশস্ত করে দেইনি?

شرح শব্দের অর্থ উন্মুক্ত করা। কুরআন মজীদে বিভিন্ন স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্ষদেশ উন্মুক্ত করে দেবার শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে, “কাজেই যে ব্যক্তিকে আল্লাহ হেদায়াত দান করার ইচ্ছা করেন তার বক্ষদেশ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।” [সূরা আল-আন’আম: ১২৫] আবার কোথাও বলা হয়েছে, “আল্লাহ ইসলামের জন্য যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং যে তার রবের দেয়া আলোতে রয়েছে, সে কি তার সমান যে এরূপ নয়? দুর্ভোগ সে কঠোর হৃদয় ব্যক্তিদের জন্য যারা আল্লাহর স্মরণে পরাভু! তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তি তে আছে।” [সূরা আয-যুমার: ২২]

এই উভয় স্থানে বক্ষদেশ উন্মুক্ত করার অর্থই হচ্ছে, সব রকমের মানসিক অশান্তি ও সংশয়মুক্ত হওয়া, জ্ঞান ও সত্য উপলব্ধি করার উপযুক্ত করা এবং বক্ষকে প্রজ্ঞার আধার করার জন্য প্রস্তুত করা। জ্ঞান, তত্ত্বকথা ও উত্তম চরিত্রের জন্যে তার বক্ষকে প্রশস্ত করে দেয়া হয়েছে। কোন কোন তাফসীরবিদ এস্থলে বক্ষ উন্মুক্ত করার অর্থ সে বক্ষ বিদারণই নিয়েছেন। হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহর আদেশে বাহ্যত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্ষ বিদারণ করে তাকে যাবতীয় পঙ্কিলতা থেকে পরিষ্কার করে তাতে জ্ঞান ও তত্ত্বকথা দিয়ে পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। [মুসলিম: ১৬৪, তিরমিযী: ৩৩৪৬] উপরোক্ত সব কয়টি অর্থই এ আয়াতে হওয়া সম্ভব, আর একটি অপরটির পরিপূরক।

অনেক বিদ্বান আলোচ্য আয়াতের অর্থ করেছেন, ‘আমরা কি তোমার বক্ষ বিদীর্ণ করি নাই’? এর দ্বারা শিশুকালে ধাত্রী হালীমার গৃহে থাকা অবস্থায় রাসূল (সাঃ)-এর বক্ষ বিদারণ এবং মে‘রাজের রাত্রিতে রাসূল (সাঃ)-এর বক্ষ বিদারণের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অত্র আয়াতের তাফসীরে ইমাম তিরমিযী মালেক বিন ছা‘ছা‘আহ ও আবু যার গিফারী (রাঃ) বর্ণিত আনাস বিন মালেক (রাঃ) প্রমুখাং মে‘রাজের বহুল প্রসিদ্ধ সহীহ হাদীসগুলি এনেছেন। হাফেয ইবনু কাসীর (রহঃ) বলেন, দুইয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা রাসূল (সাঃ)-এর বক্ষ উন্মুক্ত করার মধ্যে মে‘রাজের রাত্রির বক্ষ বিদারণ এবং নবুঅত ও রিসালাতের গুরুভার বহনের জন্য বক্ষ উন্মুক্ত করণ দুই-ই শামিল হয়েছে (তাফসীর ইবনু কাসীর)।

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ

২. আর আমরা অপসারণ করেছি আপনার ভার,

এই ভার বা বোঝা নবুঅতের পূর্বে তাঁর চল্লিশ বছর বয়সকালের সাথে সম্পৃক্ত। এই জীবনে যদিও আল্লাহ তাঁকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন; সুতরাং তিনি কোন মূর্তির সামনে মাথা ঝুঁকাননি, কখনো মদ্য পান করেননি এবং এ ছাড়া অন্যান্য পাপাচরণ থেকেও তিনি সুদূরে ছিলেন। তবুও প্রসিদ্ধ অর্থে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য সম্পর্কে তিনি জানতেন না; আর না তিনি তা করেছেন। এই জন্য বিগত চল্লিশ বছরে ইবাদত ও আনুগত্য না করার বোঝা তাঁর হৃদয় ও মস্তিষ্কে সওয়ার ছিল; যা সত্যিকারে কোন বোঝা ছিল না। কিন্তু তাঁর অনুভূতি ও উপলব্ধি তা বোঝা বানিয়ে রেখেছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁর সেই বোঝাকে নামিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করে তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করলেন। এটা {لَيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} আয়াতের অর্থের মত। (সূরা ফাৎহ ২ আয়াত)

কোন কোন আলেমগণ বলেন, এটা নবুঅতের বোঝা ছিল যেটাকে আল্লাহ হালকা করে দিলেন। অর্থাৎ, আল্লাহ এই রাস্তায় দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ বৃদ্ধি এবং দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে সরলতা সৃষ্টি করলেন।

الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ

৩. যা আপনার পিঠ ভেঙ্গে দিচ্ছিল।

যে দুঃসহ বোঝার চাপে তোমার পিঠ নুইয়ে যাচ্ছিল। এর দ্বারা ‘অহি’ অতরণকালের ভার বহনের কষ্টকর অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বোঝা বহন অসাধ্য হ’লে মুখ দিয়ে অস্ফুট স্বরে যে শব্দ বের হয়, তাকে نَقِيسُ বলা হয়। সেখান থেকে أَنْقَضَ ক্রিয়াপদ এসেছে। প্রথম দিকে ‘অহির’ ভার বহনে রাসূল (সাঃ)

অনুরূপ দৈহিক কষ্ট অনুভব করতেন। তবে ক্বাসেমী এর দ্বারা রাসূল (সাঃ)-এর মনোবেদনার কষ্ট বুঝিয়েছেন। কেননা প্রথমদিকে তাঁর দাওয়াত কেউ কবুল করত না। বরং নানাবিধ অপবাদ ও মিথ্যারোপের মাধ্যমে তাঁকে লোকেরা কষ্ট দিত। পরে এই কষ্ট দূর হয়ে যায় (ক্বাসেমী)। আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ প্রথম ব্যাখ্যার সাথে সামঞ্জস্যশীল।

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

৪. আর আমরা আপনার (মর্যাদা বৃদ্ধির) জন্য আপনার স্মরণকে সমুন্নত করেছি

নবুঅত ও রিসালাত প্রদানের মাধ্যমে তোমার সুনাম সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছি। এতদ্ব্যতীত পূর্ববর্তী নবীগণের কাছ থেকে তোমার ব্যাপারে ওয়াদা নেওয়ার ফলে (আলে ইমরান ৩/৮১) পূর্ব থেকেই তোমার আলোচনা পূর্ববর্তী উম্মতগণের নিকটে যেমন ছিল, তেমনি তোমার জীবদ্দশায় তো বটেই ক্রিয়ামত পর্যন্ত যাতে তোমার নাম সর্বত্র মুখে মুখে সর্বক্ষণ প্রচারিত হয়, তার ব্যবস্থা করেছি। যেমন আযানের মধ্যে, ইক্বামতের মধ্যে, তাশাহুদেদের মধ্যে, জুম'আ ও ঈদায়নের খুৎবায়, হজ্জের খুৎবায়, আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলিতে, ছাফা-মারওয়ায় ও হজ্জের অন্যান্য অনুষ্ঠানাদিতে, বিবাহের খুৎবায়, এমনকি বক্তৃতা ও ভাষণের শুরুতে হামদ ও দরুদের মাধ্যমে পৃথিবীর এক প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র সর্বদা তোমার প্রশংসিত নাম অত্যন্ত সম্মানের সাথে উচ্চারিত হওয়ার ব্যবস্থা করেছি। যদি একজন ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে, কিন্তু মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নবুঅতকে অস্বীকার করে, সে ব্যক্তি কাফের। তোমার দ্বীন আসার পর বিগত সকল দ্বীন রহিত করা হয়েছে। তোমার দ্বীনকে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করা হয়েছে। তোমাকে সকল নবীর উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। পৃথিবীতে মুমিনের হৃদয়ে তোমাকে সর্বোচ্চ স্থান দেয়া হয়েছে। আখেরাতে তোমাকে সর্বোচ্চ প্রশংসিত স্থান 'মাক্কায়ে মাহমুদ' দান করা হয়েছে। আসমান জগতে সকল ফেরেশতা তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকে এবং তাদের নিকটে আমরা তোমার আলোচনাকে সমুন্নত করেছি। এভাবে দুনিয়া ও আখেরাতে হে রাসূল তোমার সুনাম-সুখ্যাতিতে আমরা সর্বদা উচ্চকিত করেছি। এই সৌভাগ্য দুনিয়ার কোন মানুষের হয়নি।

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

৫. সুতরাং কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে,

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

৬. নিশ্চয় কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে।

এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ পাক স্বীয় রাসূলকে ও তাঁর উম্মতকে সাহুনা দিয়েছেন এবং একই কথা পরপর দু'বার বলে বিষয়টিকে যোরদার ও তাকীদপূর্ণ করেছেন। এটা আরবদের অন্যতম বাকরীতি।

দু'টি আয়াতেই الْعُسْرُ এসেছে معرفة বা নির্দিষ্টবাচক এবং يُسْرًا এসেছে انكره বা অনির্দিষ্টবাচক। যার অর্থ একটি কষ্টের বিনিময়ে একাধিক স্বস্তি। অতএব একটি কষ্ট কখনো একাধিক স্বস্তির উপরে জয়লাভ করে না। বুঝা গেল যে, কষ্টের পরে স্বস্তি অবশ্যম্ভাবী এবং তা হবে একাধিক। যেমন মক্কা থেকে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) একাকী আবুবকরকে নিয়ে হিজরত করেছিলেন কষ্টের সাথে। কিন্তু মক্কা বিজয়ের দিন তিনি সেখানে ফিরে এসেছিলেন দশ হাজার মুসলমানকে সাথে নিয়ে উচ্চতম মর্যাদা ও পাহাড় প্রমাণ সম্মান নিয়ে। এটির উদাহরণ ইবাদতেও রয়েছে। যেমন, ছালাতের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে তুমি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় কর। না পারলে বসে, না পারলে কাৎ হয়ে। ছিয়ামের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে, ছিয়াম রাখ। অসুখে বা কষ্টবোধ করলে ছেড়ে দাও। সফরে গিয়ে ছিয়াম ছেড়ে

দাও ইত্যাদি। অতঃপর এটি স্বাভাবিক (حَسَى) জীবনেও রয়েছে। যেমন দারিদ্র্যের পরে সচ্ছলতা, রোগমুক্তির পর সুস্থতা, বিপদমুক্তির পর স্বস্তি বহু আনন্দের বারতা নিয়ে হাযির হয়। বিষয়টি মানসিক জীবনেও (مَعْنَوِي) হ’তে পারে। যেমন কষ্টে ছবর করার যে অসীম ক্ষমতা আল্লাহ মানুষকে দান করেছেন, তা মানুষকে দৃঢ় মনোবলের অধিকারী করে এবং যেকোন বিপদ হাসিমুখে মোকাবিলা করার শক্তি দান করে। যা তার বিপদকে সহজ করে দেয়।

فَإِذَا فَرَّغْتَ فَانصَبْ

৭. অতএব আপনি যখনই অবসর পান তখনই কঠোর ইবাদাতে রত হোন।

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

৮. আর আপনার রবের প্রতি গভীর মনোযোগী হোন।

অর্থাৎ যখনই তুমি দুনিয়াবী ঝামেলা থেকে মুক্ত হবে, তখনই আল্লাহর ইবাদতে রত হও এবং একান্ত মনে তোমার প্রভুর সন্তুষ্টি কামনায় তার দিকে রুজু হও।

এখানে فَانصَبْ বলা হয়েছে, যা نَصَبْ থেকে এসেছে। যার অর্থ কষ্ট করা, চেষ্টা করা। অতএব فَانصَبْ-এর অর্থ হবে لَأَنْعِمَهُ الْعِبَادَةُ فِي شُكْرًا ‘ইবাদতের কষ্টে রত হও তাঁর নে’মত সমূহের শুকরিয়া আদায়ের জন্য’। দুনিয়াবী আকর্ষণ থেকে আল্লাহর দিকে মুখ ফিরানোটাই মূলতঃ কষ্টের বিষয়। নফসের তাবোদার যারা, তারা এটা পারে না। যারা প্রবৃত্তির গলায় লাগাম দিতে পারে এবং নফসের চাহিদাকে দমন করতে পারে, কেবলমাত্র তারাই দুনিয়ার আকর্ষণ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে আল্লাহর ইবাদতে রত হ’তে পারে।

ফরয ইবাদতের পরে শ্রেষ্ঠ ইবাদত হ’ল রাতের ছালাত, যা তাহাজ্জুদ নামে পরিচিত। এটি রাসূল (সাঃ)-এর উপরে অতিরিক্ত কর্তব্য ছিল। নিঃসন্দেহে এটা ছিল আরও কষ্টকর। সারা দিন কাফির-মুশরিকদের ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের মুকাবিলা, এরপর ভীত-সন্ত্রস্ত রাত্রির শেষভাগে উঠে আল্লাহর ইবাদতে রত হওয়া সন্দেহাতীতভাবে ছিল অতীব ক্লেশকর। মাক্কী জীবনে সাধারণ মুসলমানদের অবস্থা ছিল আরও করুণ। এই কষ্ট ও তার পুরস্কার বিষয়ে মাক্কী সূরা সাজদায় আল্লাহ বলেন,

‘তাদের পার্শ্বদেশ শয্যা থেকে আলাদা থাকে। এমতাবস্থায় তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে ও আকাংখায় এবং আমরা তাদের যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে’। ‘অতঃপর কেউ জানে না নেক আমলের প্রতিদান স্বরূপ তাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী কি কি বস্ত্র লুকাইত রয়েছে’ (সাজদা/হ ৩২/১৬-১৭)।

এটাতো হ’ল সাধারণ মুমিন-মুত্তাকী ইবাদতগুয়ার নর-নারীর জন্য। এক্ষণে রাসূল (সাঃ)-এর জন্য বিশেষভাবে কি পুরস্কার রয়েছে? সে বিষয়ে আল্লাহ বলেন, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا ‘রাতের কিছু অংশ তাহাজ্জুদ ছালাতে রত থাক। এটা তোমার জন্য অতিরিক্ত। সত্বর তোমার প্রভু তোমাকে ‘প্রশংসিত স্থানে’ পৌঁছাবেন’ (বনী ইসরাঈল ১৭/৭৯)। ‘মাক্কামে মাহমূদে’ দাঁড়িয়ে রাসূল (সাঃ) আল্লাহর অনুমতিক্রমে সমগ্র মানবজাতির জন্য শাফা‘আত করবেন। আর এই শাফা‘আতের পরেই আল্লাহ বিচারকার্য শুরু করবেন। যাকে ‘শাফা‘আতে কুবরা’ বলা হয়। এই মহা সম্মান কেবল মুহাম্মাদ (সাঃ)-কেই দেয়া হবে, অন্য

কোন নবীকে নয়। কারণ তিনিই একমাত্র বিশ্বনবী। ফরয ছাড়াও অতিরিক্ত রাতের ইবাদতের প্রতিদান স্বরূপ এটা ছিল রাসূল (সাঃ)-এর জন্য জালাত ছাড়াও অতিরিক্ত মহা সম্মান।

বস্তুতঃ আল্লাহর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ হওয়া ব্যতীত মানুষের মানবিক মূল্যবোধ তার প্রবৃত্তির উপরে জয়লাভ করতে পারে না। ইসলাম সেই প্রশিক্ষণই দিয়েছিল তার অনুসারীদের। তাই হযারো নির্যাতনেও মুসলমানগণ পুনরায় কুফরীতে ফিরে যায়নি। বরং তাদের সর্বোচ্চ মানবিক মূল্যবোধ তৎকালীন প্রবৃত্তিপরায়াণ সমাজনেতাদের উপরে সহজে জয়লাভ করে এবং তা বিশ্বজয়ী ইসলামী খেলাফতের সূচনা করে। অতএব জনশক্তি বা অস্ত্রশক্তি নয় বরং প্রধানতঃ নৈতিক ও আদর্শিক শক্তির জোরেই ইসলাম সেযুগে জয় লাভ করেছিল। এ যুগেও জয়লাভ করতে পারে সকল পার্থিব শক্তির উপরে।

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, শত নির্যাতনের মধ্যেও রাসূল (সাঃ)-কে পাঁচটা নির্যাতন প্রতিরোধের পথ বেছে নেবার হুকুম দেয়া হয়নি। বরং তাঁকে ও তাঁর সাথী নির্যাতিত-নিপীড়িত নও মুসলিমদেরকে খালেছ অন্তরে আল্লাহর প্রতি রুজু হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সমাজ বিপ্লবের মৌলিক দর্শন এর মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ যা থেকে শিক্ষা নিতে পারেন। তবে এটি ছিল মাক্কী জীবনের ঘটনা। যখন তিনি প্রতিরোধে সক্ষম ছিলেন না। অতঃপর মাদানী জীবনে সক্ষমতা অর্জন করলে তাঁকে সশস্ত্র জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয় (হুজ্ব ২২/৩৯) এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে সাধ্যমত শক্তি সঞ্চয়ের নির্দেশ দেওয়া হয় (আনফাল ৮/৬০)। এর দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ ও বস্তুগত সক্ষমতা অপরিহার্য। নইলে সর্বদা ইসলামের বিজয়ের জন্য ঈমানী শক্তিই মুখ্য। বৈষয়িক শক্তি হ'ল ঢালস্বরূপ। যাকে কখনোই মুখ্য হিসাবে গণ্য করা হয়নি।

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ-
বাক্যের মধ্যে এ ইঙ্গিত স্পষ্ট যে, হে মুহাম্মাদ! কাফেরদের লোভনীয় প্রস্তাবসমূহে কর্ণপাত করো না এবং তাদের দেওয়া কষ্ট ও নির্যাতনে ভীত ও দুর্বল হয়ে পড়ো না। কারু কাছে কিছু চেয়ো না। বরং আল্লাহর কাছেই সবকিছু চাও এবং তাঁর দিকেই একান্তভাবে মনঃসংযোগ কর। কারণ তোমাকে সাহায্য করার ক্ষমতা কেবলমাত্র আল্লাহর হাতেই নিবদ্ধ। তিনিই তোমাকে ও তোমার সাথীদেরকে কষ্টের পরে স্বস্তি দেবেন। পরকালীন পুরস্কার ছাড়াও পার্থিব বিজয় ও স্বস্তিলাভ কেবল আল্লাহর ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে। অতএব সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবল তোমার পালনকর্তা আল্লাহর দিকে রুজু হও।

পিতা ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর চাইতে অধিক অসহায়। স্ত্রী সারা ও ভাতিজা লূত ব্যতীত তাঁর প্রকাশ্য সাথী কেউ ছিল না। নমরূদের মত দুর্ধর্ষ শাসক ও একটি প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির বিরুদ্ধে একাই তাঁকে লড়াই করতে হয়েছে আদর্শিকভাবে। শত নির্যাতনের মুখেও তিনি সেদিন বলেছিলেন,

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ-

‘আমি আমার চেহারাকে সেই সত্তার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি একনিষ্ঠভাবে, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই’ (আন‘আম ৬/৭৯)। মুহাম্মাদ (সাঃ) ছিলেন ইবরাহীমের বংশধর এবং শ্রেষ্ঠ রাসূল। অতএব তাঁকেও একইরূপ নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে, إِنْ يَكُ فَارِغًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فَاصْبِرْ-সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ‘তোমার প্রতিপালকের দিকে রুজু হও’। সুবহানাল্লাহি ওয়া বেহামদিহী।

এখানে إِلَىٰ رَبِّكَ আগে আনা হয়েছে, যেটা পরে হওয়ার কথা। অর্থাৎ إِلَىٰ رَبِّكَ (তুমি রুজু হও তোমার প্রভুর দিকে)। কিন্তু আগে আনার উদ্দেশ্য আল্লাহকে নির্দিষ্ট (الحصر) করা إِلَىٰ رَبِّكَ لَا إِلَىٰ غَيْرِهِ। ‘কেবল তোমার প্রভুর দিকে রুজু হও, অন্যদিকে নয়’। অতএব কোন কাজের পূর্বে প্রথমে আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইতে হবে, অন্যের কাছে নয়। কেননা কেবল তিনিই কাজটি সহজ করে দিতে পারেন, অন্য কেউ নয়।

আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, একদিন আমি রাসূল (সাঃ)-এর সওয়ারীর পিছনে বসা ছিলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, হে বৎস! আল্লাহর বিধানসমূহ যথাযথভাবে মেনে চল, তিনিই তোমাকে নিরাপদে রাখবেন। আল্লাহর বিধানসমূহ মেনে চল, তাহলে তুমি তাঁকে সর্বদা তোমার সম্মুখে পাবে। তুমি কিছু চাইলে আল্লাহর নিকটেই চাইবে। যখন তুমি সাহায্য চাইবে, তখন আল্লাহর নিকটেই চাইবে।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে সেই অতুল্য নৈতিক শক্তি অর্জনের জন্য রাসূল (সাঃ)-কে আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ফুটনোট

- এই সূরা রাসূল (সাঃ) এর প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি নিয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
 - বক্ষ উন্মুক্ত,
 - নবুওয়তের গুরুভার অন্তর থেকে সরিয়ে দেয়া ও তা সহজ করে দেয়া,
 - সুনাম ও সুখ্যাতি
- আল্লাহ যখন কাউকে দিয়ে বড় কোন খিদমত নিতে চান ও করাতে চান, তখন উক্ত কাজের জন্য তার বক্ষকে উন্মুক্ত করে দেন এবং তাকে সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রতি অনুগত রাখেন।
- একটি কষ্টের বিনিময়ে একাধিক স্বস্তি রয়েছে।
- যখনই দুনিয়াবী ঝামেলা থেকে মুক্ত হবে, তখনই আল্লাহর ইবাদতে রত হওয়া এবং একান্ত মনে প্রভুর সন্তুষ্টি কামনায় তার দিকে রুজু হও। দুনিয়াবী আকর্ষণ থেকে আল্লাহর দিকে মুখ ফিরানোটাই মূলতঃ কষ্টের বিষয়। নফসের তাবেদার যারা, তারা এটা পারে না। যারা প্রবৃত্তির গলায় লাগাম দিতে পারে এবং নফসের চাহিদাকে দমন করতে পারে, কেবলমাত্র তারাই দুনিয়ার আকর্ষণ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে আল্লাহর ইবাদতে রত হ’তে পারে।